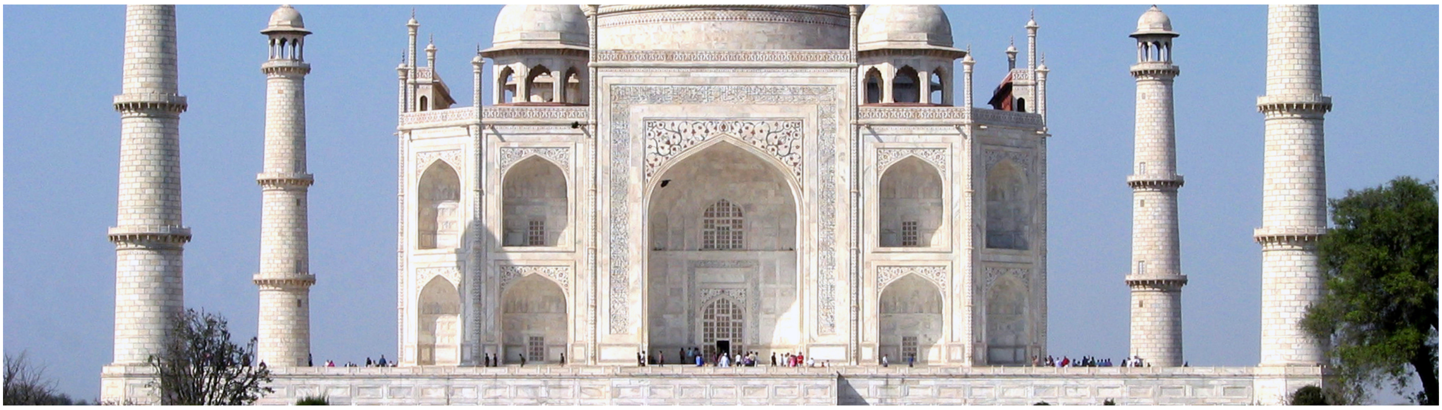

মোছলেম ভারতের চরম বিপর্যয়কাল

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

মোছলেম জাতির বিগত চৌদ্দশত বৎসরের ইতিহাস স্বাভাবতঃ পৃথিবীর যে কোন জাতির ইতিহাসের ন্যায়-ই বিভিন্ন প্রকারের বহু বিস্ময়কর ঘটনায় পূর্ণ। এই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সুখ-সমৃদ্ধি, শান-শওকত, আনন্দ-উদ্দীপনা ও পৃষ্ঠপোষকতার বহু গৌরবময় কাহিনীর বিধৃতি অবশ্যই রহিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দুর্বলতা, লজ্জা, কলঙ্ক এবং ধ্বংস-বিপর্যয়ের অনেক বেদনাদায়ক কাহিনীতেও ইহার পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হইয়া আছে। আমাদের মতে, তৃতীয় খলিফা হযরত ওছমানের শোকাবহ মৃত্যু বা শাহাদাৎ হিঃসন্দেহে মোছলেম জাতির ইতিহাসের প্রথম এবং বৃহত্তম দুর্ঘটনা। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরও জনৈক আততায়ীর হস্তে আহত হইয়া শাহাদাৎ বরণ করেন। কিন্তু অভিজ্ঞ পাঠকরা এ বিষয়ে সম্ভবতঃ আমার সহিত একমত হইবেন যে, তাঁহার এই শাহাদাৎ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আরব কবির সুরে সুর মিলাইয়া হযরত ওছমানের শাহাদাতের জন্য আমরা এইভাবে শোক প্রকাশ করিতে পরি-

(মা-কানা হাল্‌কু কায়ছিন লাহাল্‌কুন ওয়াহিদুন্

অলাকেন্নাহু বুনয়ানো কওমেন্ তাহাদ্দামা।)

□□কায়েসের ধ্বংস, একটি একক ধ্বংস মাত্র ছিল না। এই একটি মাত্র ধ্বংসের ফলে একটি জতির বুনিয়াদ চুরমার হইয়া গিয়াছিল।□□ এই ঘটনার পশ্চাদভূমিতে মোছলেম জাতিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য যে সমস্ত পাপ ও দুর্বলতা জমিয়া উঠিতেছিল, তাহাই ছিল পরবর্তীকালে কারবালার হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ।

ইহার পর তাতার জাতির অভ্যুত্থান এবং স্পেন হইতে মুছলমানদের অপ্রত্যাশিতভাবে বিতাড়ণ- এই দুইটি ঘটনাকে আমরা মুছলমানদের জাতীয় বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণরূপে উল্লেখ করিতে পারি। এই সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, অতীত ইতিহাসের এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত ও পীড়াদায়ক। কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য এই অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য্য। একটি জাতির ইতিহাস আলোচনা মূল্য এইখানেই।

মোছলেম জাতির চতুর্থ ও সর্বশেষ যে সংকট অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা হইতেছে ভারতে মোগলদের[১] সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং এই বংশে জালালুদ্দিন শাহ আকবরের অভ্যুদয়। সেই সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় সহস্র বৎসর যাবত যে সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে এছলাম ও মুসলমানদের সমাজ-জীবনের ধ্বংস সাধনে লিপ্ত ছিল, সম্রাট আকবরের নিকট তাহা সমর্থন ও উৎসাহ পাইল। তিনি এই সমস্ত বিরুদ্ধবাদের ব্যাখ্যাদাতাদের প্রচুর সম্মান ও সমাদরের সহিত তাঁহার দরবারে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। মুছলমানদের তামদ্দুনিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল সম্পদ ও শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য ভারতে যে হিন্দু মানসিকতা নীরবে অথচ অব্যাহতভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছিল- ইতিহাসের লিখিত ও সর্ব্বসম্মত রায় অনুসারে- সেই হিন্দু মানসিকতাকে জীবনধারায় প্রাধান্য দেওয়ার জন্য কোনরূপ চেষ্টার-ই তিনি ত্রুটি করেন নাই। বলা বাহুল্য, একদিকে মুছলমান চিন্তানায়কগণ যে তীব্র ভাষায় আকবরের শাসন-নীতির নিন্দা করিয়াছেন এবং অপরদিকে

মোছলেম বিরোধী ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকগণ যে তাহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও মহান সম্রাটরূপে প্রশংসাবাদ দিয়াছেন, ইহাই তাহার যথার্থ কারণ। আকবর সম্পর্কে মুছলিম ও অমুছলিম চিন্তাবিদদের এইরূপ সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী মত পোষণের মধ্যে বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি ছিল না!

মুছলমানের নিকট আকবর হইতেছেন তাহাদের অধঃপতন ও ধ্বংসের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক এবং মোছলেম ভারতের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রকৃত কারণ। অন্যদিকে মুছলমানদের এই অধঃপতিত অবস্থার মধ্যেই শুরু হয় অপর পক্ষের অগ্রযাত্রা; আকবরের সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য ব্যতীত তাহা কখনো সম্ভব হইত না। আকবর সম্পর্কে দুই পক্ষের ভিন্ন মত পোষণের কারণ ইহাই এবং ইহাই ছিল স্বাভাবিক। মোছলেম জগত বিশেষতঃ মোছলেম ভারতের অন্ধকার যুগে চাগতাই বংশের এবং বিশেষ করিয়া আকবরের রাজত্বকালীন মুছলমানদের প্রকৃত সামাজিক অবস্থা নিরূপণের ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সেই সময়কার একটি সঠিক রাজনৈতিক ইতহাস সংকলনের প্রচুর মাল-মসলা মওজুদ রহিয়াছে। যত শীঘ্র মোছলেম ভারতের চিন্তানায়ক ও অনুসন্ধানকারীগণ এই অতি আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইবেন, মুছলমানের নব-বিজয়যাত্রার পথ ততো সহজতর হইয়া উঠিবে। বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা একানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে এবং এই নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে তাহা সম্ভবও নহে। তবে নিবন্ধের মূল বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আকবরের আমলের কয়েকটি পাপ এবং বর্ত্তমান মোছলেম সমাজে তাহার প্রতিক্রিয়া বা পরিণাম সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা এখানে নেহায়েত প্রয়োজন। এই সমস্ত পুরাতন পাপের উত্তরাধিকার ভারতের মুছলমানদিগকে এত অধঃপাতে ঠেলিয়া দিয়াছে যে, পাকিস্তান দাবির সাফল্যের মধ্যেই তাহাদের একমাত্র রক্ষকবচ রহিয়াছে ভাবিয়া তাহারা আনন্দে উল্লসিত ও কর্মচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। যদি এই সমস্ত পাপ মুছলমানদের সমাজ-দেহ হইতে সমূলে উচ্ছেদ করা না যায়, তাহা হইলে বৃহত্তর আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন দূরের কথা, এই সর্বশেষ রক্ষাকবচটিকেও রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

সম্পূর্ণরূপ নিরক্ষর না হইলেও আকবর অবশ্যই শিক্ষিত ছিলেন না। সুশিক্ষার মতই সৎ সংসর্গের কল্যাণেও তিনি ছিলেন বঞ্চিত। চাগতাই বংশের ইতিহাসে কোন মহৎ ও বৃহত্তর আদর্শের চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অতি স্বাভাবিকভাবেই আকবর এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। মদ্যপান ও ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য দুষ্কর্মের পাপের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্তি এবং এই সঙ্গে নিজের আশাতীত রাজনৈতিক সাফল্যের দরুন তিনি তাঁহার চরিত্র সংশোধন সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পান নাই, আর তাহার প্রয়োজনও অনুভব করেন নাই। কোন্ আবহাওয়ার মধ্যে আকবরের হীন চক্রান্ত স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কিরূপ বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে তাহা অজানা নাই। এই অস্বাভাবিক পরিবেশের বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া আকবরের অসুস্থ কিন্তু তীক্ষ্ণ প্রতিভা একটি গতিশীল শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে এবং এইজন্যই জীবনের সকল অধ্যায়ে তাঁহার চরিত্রে একটা অদম্য উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ ঘটিয়াছে।

নানা দুষ্ট-প্রভাবে বিপথে পরিচালিত হইয়া আকবর এছলম ও মোছলেম জাতির যে ক্ষতি সাধন করিয়াছেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধে ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নহে- একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। নিম্নে এ সম্পর্কিত কযেকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা মাত্র পেশ করিতেছি-

এছলাম, মুছলমানকে বহুদেববাদী, প্রকৃতিপূজক ও পৌত্তলিকদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস পাঠে যতদূর আমরা জানিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, আকবর-ই এছলামের এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন। নিজের বিবাহিত মুছলিম পত্নীর প্রতি অতি নিষ্ঠুর উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া জয়পুরের রাজা বিহারী মলের কন্যাকে তিনি মহিষীরূপে গ্রহণ করেন। ইতিহাস পাঠে আরো জানা যায় যে, তিনি জনৈকা খ্রিস্টান রমনীকেও স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সম্রাট তাঁহার হিন্দু পত্নীগণকে মূর্তিপূজার এবং অন্যান্য ধর্মকর্ম ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাই করিয়া দিয়াছিলেন এবং এই ব্যাপারে যাহাতে কোন বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়, তৎপ্রতিও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

ইহা একটি সর্বজনবিদিত সত্য যে, সম্রাট আকবর ভারতের পাঠান শক্তি তথা ভারতের দুর্ধর্ষ সামরিক জাতির ধ্বংস সাধন করিয়া ছিলেন। যদি দেখা যাইত যে, এই বিধ্বস্ত সামরিক জাতির স্থান গ্রহণ করার জন্য তিনি আর একটি মোছলেম সামরিক জাতি গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে রাজনৈতিক উপযোগিতার অজুহাতেও অন্ততঃ তাহার এই অপকর্মকে ক্ষমা করা যাইত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তাহার পরিবর্তে সম্রাট আকবর শাহ গাজী[২]তাঁহার শঠতাপূর্ণ কূটনীতি ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে মোছলেম ভারতের সামরিক শক্তি পুনর্গঠনের সকল ভবিষ্যত সম্ভাবনা গোড়াতেই বিনষ্ট করিয়া দেওয়ার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। বাইরাম খান, আহছান খান, মোয়াজ্জম খান প্রভৃতির হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আকবরের এই ধ্বংসাত্মক নীতির জঘন্য প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাঁহার এই আত্মঘাতী নীতি মাত্র কয়েকজন প্রবাবশালী মুছলিম, বিশ্বস্ত অনুচর ও স্বজন নিধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। জনৈক ইউরোপীয় লেখকের ভাষায়, বহিরাগত বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধেও নানা দমনমূলক ব্যবস্থা

গৃহীত হইল। সম্রাট জন্মসূত্রের সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া মাত্র ২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আপন নিয়তি ও তাঁহার বুকের দানবটির সহিত নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন।[৩] আকবরকে জানিতে হইলে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অভিশপ্ত দানবটিকে জানিতে ও ইহাকে বুঝিতে হইবে।

এছলাম, মোছলেম জাতি এবং ভারতের চাগতাই বংশের ভবিষ্যৎ দুর্যোগের দিনে কাজে লাগিত- এইরূপ সকল শক্তি ও প্রতিভাকে ধ্বংস করিয়া দিয়া আকবর যখন তাঁহার চারিপাশে সৃষ্টি খুলিলেন এবং বিচারকের দৃষ্টিতে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তখন তিনি ভয়ে বিহবল হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান জাতিগুলি দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে এবং এই সমস্ত শক্তির তৎপরতার ঢেউ ইতিমধ্যেই তাহার সাম্রাজ্যের সীমায় আসিয়া লাগিয়াছে। এছলামের সামরিক শক্তি তিনি পূর্ব্বেই ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। এই শক্তির পুনরুজ্জীবন তাঁহার পক্ষে এতদিন তিনি কল্যাণকর বিবেচনা করেন নাই। উদীয়মান খ্রিস্টান শক্তির সহিত ভবিষ্যৎ সংঘর্ষ আশঙ্কা করিয়া তাঁহার বুকের দানবটি এখন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং ইংরেজদের রাজনৈতিক স্বার্থের সহিত সন্ধি স্থাপনে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া পড়িল। তাঁহার আন্তরিকতার প্রমাণস্বরূপ তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রকাশ করিলেন এবং দেশের বাহিরে ও ভিতরে এই ধরনের একটি গুজব রটিতে দিলেন যে, তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

বিদেশী খ্রিস্টান-শক্তির মতই দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু-শক্তি আকবরের গভীর উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সুযোগ পাইলে এই হিন্দু-শক্তি মোগল বংশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে, ইহা বুঝিবার মত বিচক্ষণতা তাঁহার ছিল। কিন্তু তাঁতার অনুসৃত ধ্বংসাত্মক নীতির অনিবার্য পরিণাম তাঁহার ভাগ্যে তখন নামিয়া আসিয়াছিল। তিনি এই শক্তির উপর-ই নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজেই ক্রমবর্ধমান এই হিন্দু শক্তির ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থান সম্ভাবনাকে সূচনায়-ই নির্মূল করার সাহস ও সংকল্পের পরিচয় তিনি দিতে পারিলেন না। এইরূপ অসহায় অবস্থায় অবস্থার মধ্যে পড়িয়াই তিনি তাহার বিশ্ববিশ্রুত তথাকথিত ধর্মীয় উদারতা-সহনশীলতার ছদ্ম আবরণে হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের এক অভিনব অসাধু নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হিন্দুদের নিকট তাঁহার উদ্দেশ্যের সততা প্রমাণের জন্য তিনি এছলামের অনেক বিধি-নিষেধ অমান্য করিতে লাগিলেন। মুছলমানগণ বহু-ধর্মীয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল এবং হিন্দুগণ দেশে মূর্তিপূজার অবাধ অধিকার লাভ করিল। শাহী মহলে মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা একটি নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হইল। জালালুদ্দিন আকবর শাহ গাজী স্বয়ং কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা পরিয়া চন্দন চর্চিত দেহে হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে দরবারে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। দরবারে হিন্দু পণ্ডিত ও সভাসদগণ শঠে শাঠ্যং নীতি গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা সম্রাটকে আল্লাহর আসনে বসাইয়া দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো;- এই ধ্বনিতে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়া সম্রাটের প্রতি কৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সম্রাট আকবরের প্রশংসা-কীর্ত্তনে তাহারা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, দেবী বন্দনা রচনা করিতে গিয়াও হিন্দু ভক্তকবি গাহিয়াছেন-

হেথা এক দেশ আছে নামে পঞ্চগৌড়।

সেখানে রাজত্ব করে বাদশাহ আকবর।।

অর্জুনের অবতার তিনি মহামতি।

বীরত্বে তুলনাহীন জ্ঞানে বৃহস্পতি।।

ত্রেতা যুগে রাম হেন অতি সযতনে।

এই কলি যগে ভূপ পালে প্রজাগণে।।[৪]

এই ধরনের অসাধু কার্যকলাপ ও চাটুকারিতায় বাস করার ফলে আকবরের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে এবং কালক্রমে এই দৃষ্টিবিভ্রম-ই তাঁহাকে নিকৃষ্টতম আত্মপ্রতারণার পথে ঠেলিয়া দেয়। মোছলেম ভারতের সমাজ-জীবনের বহিরাঙ্গে যে নির্জীবতা ও রুগ্ন অবস্থা তখন বিরাজ করিতেছিল, সম্রাট আকবরের নিকট তাহা এছলামের মৃত্যু লক্ষণরূপে প্রতীয়মান হইল। দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট মুছলিম ওলী-আওলিয়া, ফকিহ ও আলেমগণের হীন ও ঘৃণ্য আচরণ দর্শনে তাঁহার এই ধারণা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল।[৫] অন্যদিকে তিনি দেখিতে পাইলেন, হিন্দু জনসাধারণ, পণ্ডিত ও ধর্মপুরোহিতগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার, এমন কি স্বয়ং ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতে শুরু করিয়াছে; গর্বিত এবং উচ্চধর্ম সচেতন রাজপুত সামন্তগণ শাহী হেরেমে তাহাদের ভগ্নি ও কন্যাদের প্রেরণ করিয়াও সম্মানের সহিত তাহাদের সামাজিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া আকবর এবং তাঁহার উপদেষ্টাগণ এই সুবর্ণ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন।

হাস্যকর দীন-ই এলাহী ধর্ম নিয়মিতভাবে প্রচারের প্রস্তুতি শুরু হইল। তাঁহার এই প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতি গ্রহণের সূচনার দিকে এক আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে পারস্যের তদানীন্তন শাহ বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হন (১৫৭৫ খ্র:) এবং একজন সুন্নী শাহ তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে এছলামী-শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবপন্ন মোলহেদ নামে একটি ধর্মদ্রোহী সম্প্রদায় পারস্যে বিশেষ করিয়া কাস্পিয়ান সাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

পারস্যের রাজনৈতিক বিপ্লব ও শাসক পরিবর্তনের এই অশান্ত অবস্থায় মোলহেদ সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ দলে দলে পারস্য ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া আশ্রায় গ্রহণ করে। এই সম্প্রদায়ের এছলাম বিরোধী শিক্ষা আকবরের প্রচারিত মতবাদের অনুরূপ হওয়ায় তিনি ইহাদের সাদরে তাঁহার দরবারে গ্রহণ করেন এবং ইহাদের নেতাগণ ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁহার গোপন উপদেষ্টায় পরিণত হয়।[৬] শিয়া সম্প্রদায়ের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে তাঁহাদের দ্বাদশ ইমাম আল-হাসান আল-আসকারীর পুত্র মোহাম্মদ বা ইমামুল মেহদীকে হিজরী ২০৬ সনে (তাঁহার পিতার দাফনকার্যের সময়) শেষ বারের মত সাধারণ্যে দেখা যায়। প্রচলিত বিশ্বাস মতে, সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহার পুনরাবির্ভাবের কথা ছিল। আকবরের নবাগত এই উপদেষ্টাগণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, হিজরী অব্দের এক সহস্র বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, এই শুভ মুহূর্তে তিনি যদি নিজেকে সেই লুক্কায়িত ইমাম বা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মেহদী বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহা হইলে এক-ই সঙ্গে তাহার সকল উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হইবে।

রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে সম্রাট আকবর সেই সময় এমনি ধরনের একটা কিছু করার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়া ছিলেন। তাই এইরূপ একটা সুবর্ণ সুযোগ তিনি হাতছাড়া হইতে দিলেন না। কয়েক বৎসরের আলাপ-আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনার পর সভাপদগণের মধ্যে তিনি দীন-ই-এলাহী নামে তাহার নব উদ্ভাবিত এক অভিনব ধর্ম প্রচার করিতে শুরু করিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন বর্ণনা হইতে আমরা এই উদ্ভট ধর্মের সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করিতে পারি। তাঁহার এই ধর্ম একমাত্র তাঁহার সভাপদ এবং দরবারের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এছলামের সকল রীতি-রেওয়াজ ও মুছলিম তমদ্দুনের সর্বশেষ চিহ্নসমূহ তাহার দরবার হইতে নির্বাসিত হয়। এছলামী ছালাম বা শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের রীতি সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করা হয় এবং তাহার স্থলে সম্রাটের সম্মুখে নতজানু হইয়া সেজদা করার রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়। সভাসদগণ নব ধর্মের বিধান অনুযায়ী আল্লাহ আকবর ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া তাহাদের প্রথম আনুগত্য প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এই ধ্বনি আল্লাহ মহান অর্থে নয়, সম্রাট আকবর মহান) এই অর্থেই তাহারা উচ্চারণ করিতেন। প্রত্যুত্তরে অন্যেরা বলিতেন, জাল্লা জালালুহু অর্থাৎ সর্বোচ্চ তাঁহার জালাল (আকবরের প্রকৃত নাম) বা মহিমা- যে বিশেষণ একমাত্র আল্লাহ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। এই জালালুদ্দিন আকবর শাহ স্বয়ং আল্লাহর অবতার, এই সমস্ত ধ্বনি দ্বারা ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইত।

দরবারে সন্ধ্যা প্রদীপ প্রজ্বলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শ(?) মুছলিম সম্রাট অগ্নিদগ্ধদেবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সপরিষদ উঠিয়া দাঁড়াইতেন। এন্সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায় আকবরের হাস্যকর দীন-ই-এলাহী সম্পর্কে এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে-

এই অদ্ভুত ধর্মের পয়গম্বর ছিলেন বাদশাহ আকবর স্বয়ং...। প্রতিদিন প্রত্যুষে তিনি সমগ্র বিশ্ব উজ্জীবনকারী পরমাত্মার প্রতীকরূপী সূর্যের পূজা করিতেন। অপরপক্ষে তিনি নিজে স্বয়ং অগণিত মূঢ় নর-নারী কর্তৃক পূজিত হইতেন।[৭]

সমসাময়িক ইতহাসে আকবরের দীন-ই-এলাহী তথা স্বগীয় ধর্মের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়না। এই সম্পর্কে বদাউনী ও অন্যান্যদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে জানা যায় যে, এই ধর্মের বিধান অনুযায়ী সর্বপ্রকার খাদ্যই হালাল ছিল। হিজরী বর্ষ গণনা-রীতি বাতির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই দীন-ই-এলাহীর ফরমান অনুসারে বেশ্যাবৃত্তি আইনানুমোদিত ও ইহার উপর কর ধার্য করা হইয়াছিল। এই সমস্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় হিন্দু সমাজের সংস্কার সংক্রান্ত দুই-একটি বিধি-নিষেধের উল্লেখ পাওয়া যায়। মোটকথা, এছলাম ও মুছলিম তমদ্দুনের সকল শিক্ষা ও উপাদানের বিরুদ্ধে এক নিষ্ঠুর বিদ্রোহ ঘোষণা এবং ইন্দো-ইরানী চিন্তাধারার সমন্বয়ে একটি নূতন প্রকৃতির পূজাভিত্তিক ধর্ম প্রতিষ্ঠাই ছিল আকবরের ধর্ম-নীতির দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

> কিন্তু আকবরের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল অগভীর, তাই হিন্দু মানসিকতার মর্মমূল যথার্থ স্বরূপ অনুধাবনেরই শুধু তাঁহার ভুল হয় নাই- সেই সময়কার মুছলিম জাতির সাময়িক জড়তাকে তাহাদের মৃত্যুর লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াও তিনি বিরাট ভুল করিয়াছিলেন। যুগ যুগ সঞ্চিত পাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে এই সময়ে মুছলিম ভারতের জীবন ও আত্মা সাময়িকভাবে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিল বটে; কিন্তু তাহার মৃত্যু ঘটে নাই। কারণ, যে কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই একজন মুছলমান সব সময় মুছলমান-ই থাকিবে। যখন মুছলমানদের উপর আকবরের নির্যাতন চরমে পৌঁছিল, তখন এই নির্যাতনের কঠোর কশাঘাতে তাহাদের অন্তরের সুপ্ত অমর-আত্মা

জাগিয়া উঠিল এবং দুর্বার গতিবেগে প্রচণ্ড-আঘাত হানিয়া চলিল। মুছলিম আত্মার এই বিপুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই মুছলিম ভারতের পুনর্জাগর ও নব জয়যাত্রার শুরু।

আকবরের পক্ষে মুছলিম সমাজের এই প্রতিক্রিয়া ও নবজাগরণে বিব্রত বোধ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাই প্রধানতঃ মুছলিম সমাজকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি একটি নূতন বায়াতনামার খসড়া প্রস্তুত করিয়া তাঁহার দরবারের পরিষদ ও জ্ঞানী-গুণীবৃন্দকে তাহাতে স্বাক্ষর দান করিতে বলিলেন। যতদূর জানা যায়, দরবারের ১৮ জন সদস্য ইহাতে স্বাক্ষর দান করেন এবং একমাত্র বীরবল ছাড়া এই স্বাক্ষরকারীদের সকলেই ছিলেন মুছলমান! ইহাদের মধ্যে মাখদুমুল মুলক, আব্দুন নবী প্রমুখ তদানীন্তন মুছলিম ভারতের নেতৃস্থানীয় ফকিহ ও আলেমের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ভাবিতেও অত্যন্ত বেদনা বোধ হয় যে, এইরূপ দুইজন প্রখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিও আকবরের বায়াতনামায় স্বাক্ষর করিতে কোনরূপ কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ করেন নাই।

আইন-ই-আকবরীতে এই দীর্ঘ বায়াতনামার পূর্ণ অনুলিপি প্রদত্ত হইয়াছে।[৮] সমগ্র বায়াতনামাটি উপর একবার চোখ বুলাইয়া গেলেই পাঠকগণের পক্ষে ইহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, শ্রুতিমধুর ধর্মকথা ও বাক্যবিন্যাসের আবরণে সম্রাট আকবর ও তাঁহার ধর্মদ্রোহী উপদেষ্টাগণ এছলামের মর্মমূলেই ছুরিকাঘাত হানিতে চাহিয়াছেন। এই বায়াতনামার শর্ত অনুসারে এছলামের হুকুম-নিষেধ সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত ও রায়দানের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তথাকথিত ইসলামের সুলতান আবুল ফাতাহ জালালুদ্দীন মোহাম্মদ আকবর বাদশাহ গাজীকে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপার তিনি কোন এমাম বা মুছলিম আইনজ্ঞের মতামত নিতে বাধ্য ছিলেন না। বস্তুতঃপক্ষে কোরআন, হাদিস প্রভৃতি এছলামী ধর্মগ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ভাষ্যদান এবং এই সমস্ত ধর্মগ্রন্থের নামে চূড়ান্ত মত প্রকাশ ও রায়দানের সর্ব্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় অগ্নি ও সূর্যের উপাসক, আরবী হরফের পরিচয় জ্ঞানহীন অশিক্ষিত এবং স্বয়ং দেবতা জ্ঞানে পূজিত একজন মধ্যপ ও লম্পট সম্রাটের হস্তে। বায়াতনামার উপসংহারে এই কয়টি ধর্মদ্রোহমূলক ছত্র দৃষ্ট হইবে-

আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, যদি মহামহিম সম্রাট বিবেচনাসম্মত জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রজাবৃন্দের কল্যাণে কোন আদেশ (কোরআন বিরোধী নহে)[৯] জারী করেন, তাহা হইলে তাহা প্রত্যেকের উপর বাধ্যতামূলক ও অবশ্য পালনীয় হইবে। ইহার বিরোধিতা পরকালে লানত ও ইহজীবনে সমাজচ্যুতি ও ধ্বংস দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

আকবরের ধৃষ্টতার একানেই শেষ নাই। বায়াতনামায় স্বাক্ষর আদায় করিয়া এছলামের এই তথাকথিত ছোলতান, মোমেনগণের নেতা, ধর্মযোদ্ধা ও সম্রাট জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবর আল্লাহর মছজিদ ও রাছুলে করীমের মিম্বরের বিরুদ্ধে তাহার বিজয় অভিযান শুরু করিলেন। একদা এক জুময়ার নামাযের উপলক্ষে ফতেহপুরের জামে মছজিদটিকে খুব সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে শাহী মিছিল মছজিদের তোরণে আসিয়া পৌছিলে মছজিদের অভ্যন্তরস্থিত জামাত হইতে একদল লোক আসিয়া বাদশাহ ও তাঁহার সঙ্গীগণকে অতি সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া মছজিদের ভিতরে লইয়া যান। এই সমস্ত লোক মোছলেম আলেম ও ফকিহের বেশে সজ্জিত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা স্বয়ং বাদশাহর চর ছিল। আকবর-ই তাহাদিগকে এই উদ্দেশ্যে মছজিদে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মছজিদে জামাতের অধিকাংশ লোক-ই ছিল হয় আকবরের সভাসদ, না হয় তাঁহার ভৃত্য কিংবা আশ্রিতজন। সুতরাং বিরোধিতা অথবা প্রতিবাদের সামান্যতম আশঙ্কাও সেখানে ছিল না। এই উপলক্ষে মছজিদের মিম্বর হইতে বাদশাহ কর্তৃক খুৎবার জন্য ফেজী পূর্বেই একটি উদ্বোধনী শ্লোক রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই শ্লোকের বিষয়বস্তু বাংলায় নিম্নরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে:

প্রভু মোরে করেছেন রজ্য অধিপতি,

দিয়েছেন জ্ঞান আর সাহস শকতি।

সত্য আর ভালবাসা দিয়েছেন বুকে,

তিনিই দিশারী মোর ন্যায়ে ভুলে চুকে।

হেন ভাষা নাই করি তাঁর গুণ গান,

আল্লাহু আকবর সেই আল্লাহ মহান।

আকবর সারাজীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁহার স্বধর্মের কুৎসা ও নিন্দা-মন্দ-করিয়া গিয়াছেন। অপরপক্ষে প্রকৃতিপূজকদের ধর্মের আদর্শ ও রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সমর্থন জানাইতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ঐদিন তিনি ফতেহপুর মছজিদে গিয়াছিলেন তাঁহার জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার সর্বশেষ পর্যায়ের উপর একটা ধর্মীয় ছাপ এবং বাস্তব রূপদানের উদ্দেশ্য লইয়া। তৎকালে ফতেহপুরে এমন একজন মুছলমানেরও অস্তিত্ব ছিল না, যিনি প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটের এই ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষীণ আওয়াজও তুলিতে সাহসী ছিলেন। সকল সভাসদ এমন কি ধর্মনেতা আলেমগণও সম্রাটের এই ঔদ্ধত্যমূলক আচরণ নীরবে সমর্থন করিয়া গেলেন। সুতরাং জাগতিক দিক হইতে বিচার করিলে আকবরের পক্ষে এই কাজে কোনরূপ ইতস্ততঃ করা বা বিচলিত বোধ করার কোন কারণ-ই ছিল না। কিন্তু তদসত্ত্বেও তাঁহার হৃদস্পন্দন অতি দ্রুত হইয়া উঠিল এবং উপরোক্ত শ্লোকের প্রথম তিন লাইন আবৃত্তি শেষ করা মাত্রই মহাপরাক্রমশালী এই ধর্মদ্রোহীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং নিতান্ত অসহায় বোধ করিয়া মিম্বর হইতে তাহাকে নামিয়া আসিতে হইল। এখানে পাঠকদের নিকট ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বলার প্রয়োজন করে না যে, শ্লোকের শেষ তিন ছত্রে আকবর আল্লাহর একজন অবতার- এই দাবির পরিষ্কার ঘোষণা রহিয়াছে। কিন্তু এই ছত্রগুলি উচ্চারণে তাঁহার অসামর্থ্য ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, তিনি একজন ধর্মদ্রোহী ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিয়া আল্লাহ তাঁহার মছজিদ এবং তাঁহার প্রিয় নবীর মিম্বরের পবিত্রতা রক্ষা করিলেন। আকবরের গুণমুগ্ধ জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক এই ঘটনাটিকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেনঃ কিন্তু এই ঘটনায় যে ভাবাবেগের সঞ্চার হইল, তাহা যে দৃঢ়চিত্ত প্রবল শত্রুর মোকাবেলায়ও কখনও বিচরিত হয় নাই, তাহাকে অভিভূত করিয়া দিল। যে হৃদয় সকল বিপদে শান্ত থাকিত এখন তাহা দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। যে কণ্ঠস্বর যুদ্ধের তুমুল হট্টনিনাদ চাপাইয়াও উর্ধ্ব শ্রুত হইত, এক্ষনে বালিকার কণ্ঠের ন্যায়-ই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রথম তিনি ছত্রের উচ্চারণ সমাপ্ত করার পূর্বেই এই সম্রাট-নবীকে সেই উচ্চ মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিতে হইল।[১০]

এছলাম বিরোধী ধ্বংস অভিযান

দীর্ঘ ৪৭ বৎসরকাল রাজত্ব করার পর ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে আকবরের মৃত্যু হয়। তাঁহার জীবনের শেষ দশ বৎসরের কোন বিস্তারিত ইতহাস পাওয়া যায় না। দুইজন ঐতিহাসিকের মধ্যে আবুল ফজল ১২ বৎসর পূর্বে নিহত হন এবং বদাউনী দশ বৎসর পূর্বে এন্তেকাল করেন। পরোক্ষ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য হইতে জানা যায় যে, সম্রাটের জীবনের শেষ দশ বৎসর কতিপয় শোকাবহ ঘটনা ও মৃত্যু এবং দীর্ঘকাল যাবত যে সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, সেইসবের শোচনীয় ব্যর্থতার ফলে অত্যন্ত দুঃখময় হইয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্ত পরোক্ষ সূত্রে পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, জীবনের এই সময়টিতে আকবর এছলামের প্রতি তাঁহার আজীবন বিরোধিতা ও বিদ্রোহের দরুন গভীর আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় দগ্ধীভূত হইতেছিলেন। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ অবশ্য এই সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাহাদের মতে, আকবর তাঁহার বলিষ্ঠ ও সুস্থ বিচার-বুদ্ধি বলে যে কুসংস্কার,[১১] ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করিয়াছিলেন, সেই কুসংস্কারকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াই মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহার কোনই গুরুত্ব নাই।...

১৫৮৭ সাল পর্যন্ত মুছলমান কাজীগণের দ্বারা হিন্দুদের মামলা-মোকদ্দমার বিচারে আইনগত কোন বাধা ছিল না। কিন্তু উক্ত সালেই এক ফরমান জারী করিয়া আকবর মুছলমান কাজীদের এই অধিকার হরণ করেন। হিন্দু সভাসদদিগকে খুশি ও তুষ্ট করার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর আকবর (১৫৮৮ খ্রিঃ) রাজা ভগবান দাসের ভাগিনেয়, পালিত পুত্র (দত্তক পুত্র) এবং উত্তরাধিকারী মানসিংহকে[১২] তাহার নব ধর্ম দীন-ই-এলাহী তে দীক্ষিত করার চেষ্ট করেন। কিন্তু এই তেজস্বী রাজপুত আকবরের দাওয়াতের জবাবে বলেন, যদি জীবন উৎসর্গ করার সংকল্পই হয় মহামান্য সম্রাটের মতবাদে গ্রহণের একমাত্র অর্থ, তাহা হইলে আমার ধারণা, আমি যে সম্রাটের একজন বিশ্বস্ত অনুসারী, তাহার প্রমাণ আমি যথেষ্টই দিয়াছি। কিন্তু আমি একজন হিন্দু, সম্রাট আমাকে মুছলমান হইতে বলিতেছেন না। আমি তৃতীয় কোন ধর্মের কথা অবগত নহি। নবরত্নের অন্যতম রত্ন রাজা টোডলমলও আকবরের এই ধর্মীয় স্বৈরাচারে আত্মসমর্পণ করেন নাই।
সম্ভবতঃ ১৫৯০ খ্রিস্টব্দে একজন গোঁড়া হিন্দুরূপেই তিনি পরলোক গমন করেন। আকবর হিজরী প্রথম সহস্রাব্দ পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষটিকে ব্যবহার করার জন্য যে চাতুরিনামা তিনি লিখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই আমরা পাঠকদিগের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছি।

১৫৯১ সালে ৯৯৯তম বৎসর পূর্ণ হইল; কিন্তু আকবর নিজেকে অজ্ঞাত এমম মেহেদী অথবা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মছীহরূপে ঘোষণা করিয়া এক ধর্মবিপ্লব শুরু করিবেন বলিয়া এতকাল গোপনে যে প্রচারণা চলিয়া আসিতেছিল, হিজরী ১০০০তম বৎসরে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অলীক প্রমাণিত হইল। কীসির ভাষায়, পরবর্তী বৎসর ছিল মুছলিম অব্দের ৯৯৯তম বৎসর এবং ইহার পরে যে বৎসর আসিল, তাহা সেই সময়ে এক সহস্রাব্দের যে আশা ব্যাপকভাবে পোষণ করা হইতেছিল, তাহার সমাধি রচনা করিল।[১৩] প্রধানতঃ এইসব চরম আঘাত ও বিপর্যয়ের দরুন আকবরের জীবনের শেষকাল অত্যন্ত দুঃখময় হইয়া উঠে এবং

তাহার মনের সকল শান্তি তিরোহিত হয়।.....

তাই এখানে আমরা আকবরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের এই সমস্ত অশুভ উত্তরাধিকারের মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। দ্রুত নেতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন মুছলমানদের সামাজিক, তামদ্দুনিক ও ধর্মীয় জীবনের সকল স্তরে কিরূপ গভীর ও ব্যাপকভাবে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়াছিল, নিম্নোক্ত নজীরগুলি হইতেই তাহার কিছুটা ধারণা পাওয়া যাইবে।

১. ১৬০৯ খ্রিষ্টব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স আগ্রায় আগমন করেন- যথেষ্ট খাতির-যত্ন করিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লওয়া হয়। সম্রাট (জাহাঙ্গীর) তাহাকে ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহাকে খেতাব ও বৃত্তিদান করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বিবাহ করিলে ও ভারতে বসতি স্থাপনে রাজী থাকিলে তাঁহার সহিত শাহী মহলের একজন শ্বেতাঙ্গ তরুণীকে বিবাহ দানের প্রস্তাব করেন।

২. খ্রিস্টানদের প্রতি তাহার সৌজন্যের (জাহাঙ্গীরের) মাত্রা এতদূর গড়াইয়াছিল যে, শাহী পরিবারের কয়েকজন শাহজাদা পর্যন্ত আগ্রার গির্জায় প্রাকশ্যে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ক্যাপ্টেন হকিন্সের নেতৃত্বে পরিচালিত স্থানীয় খ্রিস্টান বাসিন্দা ও পঞ্চাশজন অশ্বারোহী পরিবৃত হইয়া মিছিল করিয়া তাঁহারা গির্জায় গমন করিয়াছিলেন। (কীনি ও কেঞ্চ)

৩. তিনি (জাহাঙ্গীর) রাত্রিকালেই তাহার বন্ধু-সমাজকে লইয়া মদের নেশায় মাতিয়া উঠিতেন। শাহী মহলে সকল জাতির ইউরোপীয়দের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। তিনি এই ইউরোপীয়দের সহিত ভোর-রাত্রি পর্যন্ত সুরা পানে মত্ত থাকিতেন। (কাট্রন)

৪. মানুসি বেগম মমতাজ মহল সম্পর্কে লিখিয়াছেন, খ্রিস্টানদের বিশেষতঃ পর্তুগীজদের প্রতি বেগমের মন খুবই বিরূপ ছিল। যৌবনে তাঁহার ফুফু সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের নিকট তিনি যে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, অংশতঃ সেই শিক্ষা এবং অংশতঃ জেসুইটগণ কর্তৃক ধর্মান্তরিত তাঁহার দুই কন্যাকে হুগলীর পর্তুগীজগণ কর্তৃক আশ্রয় দানকেই তিনি (মানুসি) পর্তুগীজগণ প্রতি তাঁহার বিরূপ মনোভাবের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৫. জাহনারা বেগম দিল্লীতে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার কূট কৌশল ও প্রভাত সূর্যের উপাসিকা ভগ্নী রওশানারার সহিত ১৬ বৎসর অতিবাহিত করেন। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।[১৪]

৬. মানসিংহ ছিলেন একজন রাজপুত বীর ও মূর্তিপূজক হিন্দু। আকবর কর্তৃক তাঁহাকে তাঁহার দীন-ই-এলাহী ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানাইলে তিনি যে তেজস্বিতাপূর্ণ না-বোধক জওয়াব দিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। মানসিংহের এই আচরণের সহিত আকবরের দরবারের শ্রেষ্ঠ মুছলিম আলেম ও ফকিহগণের আচরণ তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই সময়ে মুছলিম সমাজ অধঃপতনের কোন শোচনীয় স্তরে ও অতল গহ্বরে নামিয়া গিয়াছিল। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, একমাত্র বীরবল ছাড়া আর কোন হিন্দুকেই আকবর তাঁহার দীন-ই-এলাহী ধর্ম গ্রহণে সম্মত করাইতে পারেন নাই। অথচ অন্যদিকে শেখ আবদুন নবী ও মাওলানা মাখদুমুল মুলকের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্মনেতাগণসহ দরবারের প্রায় সকল মুছলিম সভাসদ-ই তাঁহার রচিত বয়েতনামায় স্বাক্ষর দান করিলেন। শাহী মহলের নওরোজ উৎসবে এছলামের ছোলতান খেতাবধারী এই সম্রাট কর্তৃক রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মুছলিম ধর্মনেতা ও আলেমগেণের সুরা পানের আমন্ত্রণ এবং পরম কৃতজ্ঞ চিত্তে এই সমস্ত ধর্মনেতা ও আলেমগণ কর্তৃক সেই আমন্ত্রণ গ্রহণের অতি মর্মন্তুদ কাহিনীও সমসাময়িক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।[১৫] আকবর এবং তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণের সময় মুছলমান লেখকগণ হিন্দী ভাষায় হিন্দু ধর্মের ভাব ও আদর্শ সম্বলিত পুস্তক প্রণয়ন করিতে শুরু করেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে মদন শতক, সামুদ্রিকা ইত্যাদি পুস্তকের নাম উল্লেখ করিতে পরি।

এই পুস্তকের সূচনায় গ্রন্থকারগণ গণেশ, রামচন্দ্র প্রভৃতি দেবতার বন্দনা গাহিয়াছিন। রামভূষন নামক পুস্তক প্রণেতা ইয়াকুব খান, রাধাকৃষ্ণ, সরস্বতী ও গৌরী শঙ্করের স্তুতি-কীর্ত্তন এবং এইসব দেব-দেবীর প্রতি পূজা নিবেদন করিয়া ধর্মীয় উদারতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।[১৬]

> ৭. ...আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে মুছলমানগণ ছালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পরিবর্তে বাদশাহকে নতজানু হইয়া সেজদা করিতেন অথবা তাহাদিগেকে এইরূপ করিতে বাধ্য করা হইত। আইন করিয়া এই সময় গো-বধ করা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মুছলমানদিগেকে বহু অনৈছলামিক আইন ও ফরমান মানিয়া চলিতে বাধ্য করা হয়। মছজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি নজর দেওয়া হইত না। রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও মেরামত কার্য্যের অভাবে বহু মছজিদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। অনেক মছজিদ হিন্দুরা ধ্বংস করিয়া দেয় অথবা মন্দির ও নাট্যশালায় রূপান্তরিত করে। জাহঙ্গীরের বিজাপুরের মছজিদসমূহ সম্পর্কে ফেরিস্তা লিখিয়াছেন, তারা (হিন্দুরা) মছজিদে প্রবেশ

করিয়া সেখানে মূর্তিপূজা করিত এবং বাদ্যযন্ত্র সহযোগে দেব-দেবীর স্তুতিবন্দনা গান গাহিত।”[১৭]

৮. বিশ্বের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ। পৃথিবীর রাজা-বাদশাহগণ তাঁহার অধীন প্রজা মাত্র। আল্লাহর কাছে তাঁহাদের মর্যাদা আর দশজন সাধারণ মানুষের মর্যাদার অধিক নয়। ইহাই মুছলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের অনুপ্রাণিত হইয়া মুছলমান রাজা-বাদশাহগণ তাঁহাদের মুদ্রার এক পার্শ্বে কোন না কোন আকারে কলেমা কিংবা আল্লাহর কোন একটি নাম অঙ্কিত করিতেন। ভারত হইতে এছলামের নাম-নিশানা মুছিয়া দেওয়ার অতি ব্যগ্রতায় আকবর এই রীতি বাতিল করেন; এবং অগ্নি উপাসকগণের মধ্যে প্রচলিত সৌর বৎসরের নাম অঙ্কনের প্রথা প্রবর্তন করেন। তাঁহার যোগ্য পুত্র জাহাঙ্গীর মুদ্রায় “মুদ্রা প্রস্তুতকালে সূর্য যে রাশিচক্রে অবস্থান করিবে, সেই রাশিচক্র মুদ্রিত হইবে”-এই মর্মের এক ফরমান জারী করিয়া আকবরের অনাচারকে চাড়াইয়া যান।

৯. আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রের ন্যায় মোগল চিত্রকলা ও স্থাপত্যেও হিন্দু প্রভাব এত অধিক প্রাধান্য লাভ করে যে, এই দুই সম্রাট মছজিদ নির্মাণেও হিন্দু ভাব ও আদর্শের ছাপ দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

১০. আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, ইংরেজ ও খ্রিস্টানদিগকে আকবর নানাভাবে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর এই সমস্ত শ্বেতাঙ্গ পরিবৃত হইয়া পানশালায় উৎসব-যামিনী যাপনে মত্ত রহিয়াছেন। এইসব রাজনৈতিক বর্ণিকের দলও যেসুইট খ্রিস্টানেরা দরবারী নওরতনের সৌন্দর্য উপভোগ করিতে অথবা ধর্মের বাণী প্রচার করিতে সুদূর ইংল্যাণ্ড হইতে ভারতে আগমন করে নাই। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ পত্তনের উদ্দেশ্যে লইয়াই তাহারা এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের সমাধি রচনার কাজ আকবর-ই শুরু করেন এবং তাঁহার মদ্যপ পুত্র, স্যার টমাস রো ও তাহর মূল পুরোহিত অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত চতুর কূটনীতিবিদ রোরেণ্ড ই. ফেবিকে অতি মাত্রায় প্রশ্রয় দান করিয়া এই কাজটিকে তরান্বিত করেন। আকবরের সময়ে ইংরাজেরা সুরাট বন্দরে নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে। তিন বৎসর মোগল দরবারে চেষ্ট-তদ্বির করিয়া স্যার টমান রো জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে তাহার সকল দাবী-দাওয়া ও আরজি মঞ্জুর করাইয়া লইতে সক্ষম হন। জাহাঙ্গীরের এই মঞ্জুরির শর্ত অনুযায়ী ইংরেজগণ অন্যায় বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা লাভ ছাড়াও তাহাদের সুরাটস্থিত কারকানটিকে একটি শক্তিশালী সৈন্যশিবিরে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হয়। সুরাট সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে ‘এন্সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায়’-বলা হইয়াছে, “মূল ভূখণ্ডের যে স্থানটিতে ইংরেজরা প্রথম কারখানা স্থাপন করিয়া ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বীজ বপন করেন, নগরীটি সেই স্থানেই অবস্থিত। শাহী মঞ্জুরির শর্ত অনুসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শুধুমাত্র সুরাটেই নয়, মোগল সাম্রাজ্যের বহু কেন্দ্রে কারখানা স্থাপনের অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। টামাসো’র ভারত ত্যাগকালে সুরাট, আগ্রা, আহমদাবাদ ও ব্রুচে ইংরেজদের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত কারখানার কর্তৃত্ব সুরাট কারখানার প্রধান কর্মকর্তার হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। উক্ত কর্মকর্তা কারখানা পরিচালনা ছাড়াও পারস্যের লোহিত সাগর উপকূলস্থিত বন্দরসমূহের সহিত কোম্পানীর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন।[১৮] মোগল সাম্রাজ্যের সিকল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমরিক ঘাঁটিসহ ইংরেজদের কারখানা গড়িয়া উঠে।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ’র মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস’ গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

তথ্যসূত্রঃ

[১] ‘মোগল সাম্রাজ্য’ শব্দটি স্পষ্টতঃই বিভ্রান্তিকর...। টার্ক্স ইন ইন্ডিয়া, ২য় পৃষ্ঠা।

[২] মর্ডার্ণ ইন্ডিয়া হিস্টরি, সরকার, ৬১ পৃ:।

[৩] টার্ক্স ইন ইন্ডিয়া, ৬ পৃ:।

[৪] চণ্ডী, মাধবাবার্য্য কর্তৃক ১৫৭৭ খ্রি: রচিত ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ ৩৭২ পৃ:।

[৫] বদাউনী, আইন-ই আকবরী, মাকতুবাতে মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী ইত্যাদি।

[৬] হিস্টরি অব ন্যাশনালিজম, ৩১ পৃ:।

[৭] ভারতের শিল্পকলাঃ ১৪শ সংস্করণ।

[৮] ব্লকম্যানের আইন-ই আকবরী, ১ম খণ্ড ১৮৬ পৃ:।

[৯] আকবর কিরূপ হীন স্তুতিমূলক উপায়ে এখানে কোরআনের মর্যাদা রক্ষার প্রয়াস পাইয়াছেন, পাঠকগণকে নিশ্চয়ই তাহা বুঝইয়া বলার প্রয়োজন করে না। তাঁহার ভক্ত ইংরেজ লেখকগণ একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বায়াতনামার মুখবন্ধ ও মূল অংশে এছলামের সহিত আপোস ও উহার প্রতি মনোভাব লক্ষিত হইলেও আসলে উহা ছিল একটি নুতন ধর্মের-ই বায়াতনামা। হেনরী জর্জ কীনি, মোগল সাম্রাজ্য নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

[১০] টার্ক্স ইন ইন্ডিয়া, ৬৯ পৃ:।

[১১] কুসংস্কার বলিতে এই সমস্ত ঐতিহাসিক এছলামকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মজার কথা এই যে, আকবরের পুতুলপূজা, জড়পূজা এবং তাহার ত্রিত্ববাদ বিশ্বাসের মধ্যে কুসংস্কারের কোন চিহ্ন তাহরা দেখে নাই।

[১২] ফৈজি আকবরের মৃত্যুর দশ বৎসর পূর্বে পরলোক গমন করেন।

[১৩] টার্ক্স ইন ইন্ডিয়া, ৭১ পৃ:।

[১৪] টার্ক্স ইন ইন্ডিয়া, ৯৫, ১০০, ১২১ ও ১৩৫ পৃ:।

[১৫] বদাউনী।

[১৬] বিস্তারিত বিবরণের জন্য ১৯৩৯ সনের হিস্টোরিক্যাল কংগ্রেস মোগল যুগ অধ্যায়ের ৭-১৬ পৃ: দ্রষ্টব্য।
[১৭] কনফেডারেসী অব ইন্ডিয়া, ৫১পৃ:।

[১৮] টেক্সট বুক অব মডার্ণ ইন্ডিয়া হিস্টরি, ২য় খণ্ড, ১৭ পৃ:।

সূত্রঃ জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃতি, জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক ২০০৪ গ্রন্থ।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ